সৃষ্টিতত্ত্বের গালগপ্প বনাম বিবর্তনের শিক্ষা

মেহুল কামদার

অনুবাদক: তানবীরা তালুকদার

অনেক অনেক বছর আগে ভারতে আমার ছোট্টবেলার এক ঘটনা। আমি তখন আমার দাদাবাড়িতে। খুব কষ্ট করে আমার দাদা বাড়ি তথা তার চশমার শোরুম-এর ছাদে উঠেছিলাম। এমনি এমনি ছাদে উঠিনি, মনে ধান্দা ছিলো একটা। ভাবছিলাম, সেদিনের ইতিহাস ক্লাশে পড়ানো আর্কিমিডিসের একটা পরীক্ষা হাতে নাতে করা যায় কিনা। আসলে স্কুলের স্যার সেদিন আমাদেরকে আর্কিমিডিস কিভাবে সূর্যরশ্মির সাহায্যে "পার্শিয়ান নৌযান পুড়িয়ে" দিয়েছিলেন সে সম্বন্ধে পড়িয়েছিলেন। আর বলেছিলেন আমরা নিজেরাই চশমার কাচ ব্যবহার করে একই পদ্ধতিতে ছোট কাগজ পোড়াতে পারব। আমি দোকানে রাখা বিশাল বাক্স থেকে খুজে পেতে দশ ডাইঅপ্টারের একটি কাচ বের করে নিলাম এবং সেটা নিয়ে মাদ্রাজের তীব্র রোদ উপেক্ষা করে বাইরে চলে এলাম হাতে একটা শক্ত কাগজ নিয়ে। তখনও আমি স্কুলের পোষাক পাল্টায়নি, আমি প্রচন্ড মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম কাচের ভেতর দিয়ে সূর্যরশ্মিকে কাঁচের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীভূত করে কাগজটাকে পুড়িয়ে দিতে। কিছুটা সময় অপেক্ষার পর আমি দেখতে পেলাম, কাগজের মাথায় যেখানে আলো পড়েছিল সেখানটায় একটা কালো দাগ পড়েছে, এবং একটা মৃদু ধোঁয়ার কুন্ডলী উঠছে। আলোক রশ্মির দ্বারা কাগজটা পুড়েছে। এটা আমার জন্য একটি দম বন্ধ করা মুহূর্ত - আমি কাচের ভেতরের রশ্মির সাহায্যে আস্তে আস্তে বোর্ডের উপড় আমার নাম লেখার চেষ্টা করছিলাম, প্রথম তিনটা অক্ষর লেখা হতেই আমি আনন্দে আমার হাতের কাপুনি এবং আমার উত্তেজনা টের পেতে লাগলাম। ঠিক সেসময় আমার মা আমাকে ছাদের লাগোয়া রান্নাঘর থেকে ডাক পাড়লেন, "মেহুল, তুমি এই রোদের মধ্যে ছাদে বসে কি করছ"? আমি মায়ের দিকে না তাকিয়েই সানন্দে চিৎকার উত্তর দিলাম, "আমি কাচ দিয়ে সূর্যের আলো দিয়ে কাগজে আমার নাম লিখছি"। আমি কিছু বুঝে উঠার আগেই মা দৌড়ে এসে খপ করে আমার হাত থেকে সব কেড়ে নিলেন। আমি হতভম্ব চোখে তাকিয়ে মাত্র জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম আমি কি কিছু ভুল করেছি, ঠিক তখনই আমার গালে কষে একটা চড় পড়ল। চড়ের সাথে বলা মায়ের কথাগুলোও এখনও আমার মনে আছে, যদিও গুজরাটি থেকে অনুবাদ করলে ভাষাটা অনেকটাই তার মাধুর্য্য হারাবে। তিনি আমাকে বললেন, "সূর্য দেবতা রেগে যাবেন", আম সজল নেত্রে মাকে বল্লাম, সূর্য রশ্মি ব্যবহার করলে সূর্যদেব যদি রেগেই যেতেন তাহলে তিনি পার্শিদের বিরুদ্ধে গ্রীকদের যুদ্ধে তাদেরকে জেতার জন্য রশ্মি দিয়ে সাহায্য করতেন না। প্রায় সাথে সাথেই আর একটি চড় অবধারিত ভাবে গালে নেমে এলো। আমি বুঝতে পারলাম ধর্মীয় অতিকথা নিয়ে প্রশ্ন করা বিপদজনক - যা আমি সেই কিশোর বয়সে বুঝেছি অনেকেই তা হয়ত তাদের জীবন দিয়ে শিখেছেন।

তারপরও ধর্মকথা আমাকে প্রবল ভাবে আকর্ষন করে। মায়ের কাছে প্রত্যকে বার চড় খাওয়া মানেই ভারতের সংস্কৃতিতে দাদীর কাছে প্রত্যেকবার আদর পাওয়া। আমাদের দাদী যখন আমরা ছোট ছিলাম তখন আমাদেরকে গান গেয়ে ভোলাতেন আর যখন বড় হলাম তখন গল্প বলে ভোলাতেন। দাদীর বিশাল গল্পের ভান্ডারে আমাদের প্রত্যেকেরই পছন্দের আলাদা গল্প ছিল, এবং দাদী খুব খুশি মনেই সে সব গল্প আমাদেরকে বারবার শুনিয়ে যেতেন। দাদীর গল্প আমাকে এতোটাই মুগ্ধ করেছিল যে অনেক অনেক বছর পড়ে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য পড়তে আগ্রহী হই। যাক সেটা অন্য আর একটি গল্প। কিন্তু যখন মুক্তমনাতে ডারউইন ডে'র উপর লেখা দেয়ার জন্য সবাইকে আমন্ত্রন জানানো হলো, আমি অতি সহজেই সেটিকে এড়িয়ে যেতে পারতাম এই ভেবে যে এই বিষয়ের উপরতো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমি পড়িনি। যে এ্যামেরিকায় বাস করে অতীতে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মধ্যে ধর্মের রূপকথাকে কেন্দ্র করে (যাদের অধুনা অবতার হলো "Intelligent Design" বা 'সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প') স্মরন রাখার মতো যুদ্ধের কথা জেনেছি, এবং তাদের সে যুদ্ধ এখনো নানাভাবে দেখছি, বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির আলোকে এই সৃষ্টিতত্ত্বের উপকথাগুলো নিয়ে আলোচনা করাটা আমার জন্য বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বিভিন্ন দেশের শত শত উপকথার নানা রকম তথ্য দিয়ে শত শত ওয়েব সাইট তৈরী হয়েছে। যেমন আশা করা যায় কেউ কেউ আছেন ধর্মের গল্প গুলো শুধু শুনেছেন এবং সেই শোনা গল্পগুলোই মানব জাতীর জন্য লিখে ফেলেছেন, আবার কারো কারো কাছে হয়তো এই গল্পগুলো শুধুই উপভোগ্য কল্পিত গল্প মাত্র, বিভিন্ন যুগের গল্প গুলোকে এক সাথে জোড়া দিলে মানুষের চিন্তা ভাবনার বিকাশের স্তরগুলো পাওয়া যায়। তাদের কথানুযায়ী ধর্মের উপকথা থেকে মূল বক্তব্য নেয়া প্রয়োজনীয় বলে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এমন কোন আজগুবী ওয়েব সাইট থেকে গল্প নেবো যারা এই গল্পগুলোকে সত্যি বলে প্রমান করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। কোন নিরশ্বরবাদী কিংবা স্বাধীন চিন্তা ভাবনার ওয়েব সাইট থেকে যদি তথ্য সংগ্রহ করি তাহলে হয়তো তাদের তথ্যে লেখায় আমার নিজস্ব চিন্তা ভাবনার ছাপ পড়ে যেতে পারে। আর যে ওয়েব সাইট গুলো বিশ্বাস করে যে এই গল্প গুলো ভবিষ্যতের কোন একটি বিরাট ইঙ্গিত বহন করছে তারা অনেক রঙ চঙ দিয়ে সেই গুলোকে বিস্তারিত ভাবে পরিবেশন করেছে।

ইহুদী-খ্রীষ্টানদের মিথ দিয়েই শুরু করি। বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন যাকে এই সংখ্যাটি উৎসর্গ করা হবে তার মতবাদের সাথে প্রথমেই যাদের মতবাদের সরাসরি - তারা হলেন মূসা- খ্রীষ্টের অনুসারীরা। বাইবেলের সৃষ্টি তত্ত্বের জেনেসিস অধ্যায়টি মনোযোগ দিয়ে পড়লে এটি খুব সহজেই বোঝা যায় -

শুরুতেই স্রষ্টা প্রথমে স্বর্গ তৈরী করেছেন আর পৃথিবী। পৃথিবী তখন ছিল আকারহীন এবং অকার্যকর একটা জায়গা। এর মুখায়ব ছিল অন্ধকারে ঢাকা। স্রষ্টার চিন্তা তখন পানির দিকে ঘুরল। ষ্টা তখন বললেন, আলো হোক, জগত আলোয় ভরে উঠল। স্রষ্টা আলো দেখে মুগ্ধ হলেন, তিনি অতঃপর আলোকে অন্ধকার থেকে আলাদা করলেন। আলোকে স্রষ্টা নাম দিলেন দিবা আর অন্ধকারকে নাম দিলেন রাত্রি। আর সন্ধ্যা এবং সকাল হলো দিনের প্রথম সূচনা। তারপর তিনি বললেন সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে একটি মহাকাশ তৈরী হোক, এবং এরপর পানি পানি থেকে পৃথক হোক। এরপর তিনি মহাকাশ তৈরী করেন, তারপর তিনি মহাকাশের উপরের পানি থেকে নীচের পানি আলাদা করেন। এবং এভাবেই এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে।

অ্যাপাচি রূপকথার সাথে এই রূপকথার গল্পের পার্থক্য কতো :

শুরুতে কিছুই ছিল না, না পৃথিবী, না আকাশ, না চাদ, না সূর্য, শুধুই অন্ধকার ছিল চারিধারে। হঠাৎ করে অন্ধকার থেকে একটি হালকা গোলাকার সমতল একটা চাকতি বেরিয়ে আসল, যার এক পাশ হলুদ আর অন্যপাশ সাদা, মধ্যকাশে ঝুলন্ত অবস্থায় এটিকে দেখা গেলো। সেই পাতলা গোলাকার চাকতির মধ্যে একজন শুভ্র সফেত পোষাক পড়া দাড়িওয়ালা স্রষ্টা বসে আছেন । যেনো এইমাত্র তিনি লম্বা ঘুম থেকে দুইহাতে চোখ মুখ কচলে উঠে বসলেন।

যখন তিনি অসীম অন্ধকারের দিকে তাকালেন, উপড়ে আলো জ্বলে উঠল। তিনি নীচের দিকে তাকালেন সেখানেও আলোর সমুদ্র তৈরী হলো। পূর্ব দিকে তিনি অত্যন্ত দ্রুত উজ্জল হলুদাভ প্রত্যুষ তৈরী করলেন। পশ্চিম দিকের চারপাশ জুড়ে ছড়িয়ে দিলেন অনেক রঙের আনাগোনা। নানা রঙের মেঘও ছিল অবশ্য।

আর কারা এসব রুপকথায় বিশ্বাস করে বলে আপনি ভাবছেন :

লক্ষ্য লক্ষ্য অগনিত বছর ধরে যে অন্ধকার ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, যখন স্বর্গ - মত্য কিছুই ছিল না, ধু ছিল সীমাহীন স্বর্গীয় বিধি বিধান। তখন দিন আর রাত ছিল না, সূর্য বা চাদ ছিল না। যেনো স্রষ্টা সীমাহীন এক অতল নিদ্রায় তলিয়ে ছিলেন। সৃষ্টির কোন সংজ্ঞা ছিল না, কোন বানী ছিল না, আলো - বাতাস কিছুই ছিল না। জন্ম, মৃত্যু বা পরকালের জীবনের কোন অস্তিত্ব ছিল না। কোন মহাদেশ, কোন অঞ্চল, কোন বহতা নদী বা সাত সমুদ্রের সীমারেখা ছিল না। ইহকাল - পরকাল, স্বর্গ - মর্ত্য, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সময়ের কোন কিছুরই কোন অস্তিত্ব ছিল না। জন্ম - মৃত্যু তখন আসেওনি, ফিরেও যায় নি।

(এটা শিখ সৃষ্টিতত্ব থেকে নেওয়া হয়েছে)

(চলবে) তানবীরা তালুকদার
৩০. ০৫. ০৮